Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-III, April 2025, Page No. 54-65
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

জগতের নিমিত্ত কারণ: ন্যায়দর্শন সম্মত একটি বিশ্লেষণ

সোহেল রানা, *গবেষক, দর্শন ও জীবন-জগৎ বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.04.2025; Accepted: 29.04.2025; Available online: 30.04.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Who ignited the radiant flame of the universe, and whose unseen hand guides the celestial dance of existence? i.e., who has created and maintains this beautiful universe, has traditionally been central to metaphysical philosophical inquiry. In the Indian philosophical sphere, Nyāya-Vaiśeṣika philosophy provides a rational and theistic account of the efficient cause (nimitta kāraṇa) of this world, where God is established as an intelligent being, the creator and regulator of this universe. According to the Nyāya-Vaiśeṣika philosophy, the world is not created by itself. For them, the order, purposiveness, and intelligibility observed within this world indicate the existence of an intelligent, efficient cause behind its creation. Classical texts like Nyāyasūtra, along with the commentaries of Vātsyāyana and Uddyotakara, employ a systematic inferential argument (anumāna) to prove the existence of God as the cause of the existent world. The foundation of their argument lies in the theory of causation (kārya-kāraṇa). They consider this existing world as an effect (kārya) and seek to establish the existence of an intelligent being (kāraṇa) as its cause. They argue that, just as a pot (ghaṭa) implies the existence of a potter (kumbhakāra) responsible for its creation, this well-ordered universe indicates the existence of its creator. In this paper, an attempt has been made to discuss the role of God as the efficient cause in the origination of the world from the perspective of Nyāya philosophy. In doing so, we have begun by discussing the theory of causation and the three kinds of causation: material, non-material, and efficient cause. Then, we critically examine the Nyāya theory of the efficient cause of the world. In conclusion, a brief overview has been provided regarding the significance and influence of efficient cause in the origination of the world.

Keywords: Nyāya Philosophy, kārya-kāraṇa, Nimitta kāraṇa, God, World.

দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অধিবিদ্যা। বস্তুর যথার্থ স্বরূপ নিয়ে অধিবিদ্যা অনুসন্ধান করে।[১] অধিবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জগতের উৎপত্তি। জগৎ যেহেতু কার্য, তাই জগতেরও বিভিন্ন কারণ রয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে ন্যায়দর্শন সম্মত জগতের নিমিত্ত কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় নিমিত্ত কারণকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। চার্বাকগণ নিমিত্ত কারণ স্বীকার করেন না। তাঁরা মনে করেন প্রত্যক্ষসিদ্ধ ভূত চতুষ্টয়ের সংমিশ্রনে এই জগত ও জগতের যাবতীয় বিষয় উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে জড় উপাদানগুলি নিজে নিজে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। একজন চেতন কর্তার উপস্থিতিতে জড় উপাদান থেকে কিছু উৎপন্ন হয়ে থাকে। মৃত্তিকা থেকে নিজে নিজে ঘট উৎপন্ন হয় না, সেইজন্য একজন কুম্ভকার ও তাঁর যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয়। সুতরাং, নিমিত্তকারণের সাহায্যে জড় উপাদান থেকে কোন কিছু উৎপন্ন হয়ে থাকে। ন্যায়মতে জগতের যাবতীয় বিষয়বস্তু ও জগত নিমিত্তকারণকে অপেক্ষা করে থাকে। কিন্তু চার্বাকগণ তা স্বীকার করেন না। তাঁরা মনে করেন, জড় উপাদানগুলি নিজেদের স্বভাববশত পরস্পর মিলিত হয়ে বা যদৃচ্ছভাবে বিভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি হয়।

ন্যায়মতে বাহ্যজগৎ কার্যকারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ। জগতে কোন কিছুই আকস্মিকভাবে গড়ে ওঠে না। তবে এই কার্যকারণ সম্পর্ক নিত্য পদার্থের ক্ষেত্রে স্বীকার করা হয় না। অনিত্য পদার্থের ক্ষেত্রেই কার্যকারণ সম্পর্ক স্বীকার করা হয়। ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে সাতটি পদার্থ স্বীকার করা হয়।[২] এদের মধ্যে নিত্য ও অনিত্য উভয় পদার্থই স্বীকার করা হয়। নিত্য পদার্থ উৎপত্তি ও বিনাশ রহিত। অন্যদিকে অনিত্য পদার্থ উৎপত্তি ও বিনাশশীল। কিছু নিত্য পদার্থ হল দিক, কাল, আত্মা, আকাশ ইত্যাদি। অন্যদিকে ঘট, পট, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি অনিত্য পদার্থ। এই অনিত্য পদার্থগুলি উৎপত্তি হবার পূর্বে ছিল না, পরে উৎপন্ন হয়েছে এবং এই পদার্থগুলি একটি সময়ে ধ্বংসও হয়ে যাবে। ন্যায়-বৈশেষিক মতে এই অনিত্য পদার্থগুলিকে 'কাদাচিৎক' বলে অভিহিত করা হয়। কেননা, একটা সময় এই পদার্থের উপস্থিতি থাকে, সময়ের ব্যবধানে এর উপস্থিতি বিনষ্ট হয়ে যায়। ন্যায়-বৈশেষিকগণ মনে করেন, একাধিক কারণের সমন্বয়ে এই উৎপত্তি বিনাশশীল পদার্থ অর্থাৎ কাদাচিৎক পদার্থের উৎপন্ন হয়েছে। এই পদার্থ সমূহের মধ্যে যখন এক বা একাধিক কারণের বিনাশ ঘটে তখন পদার্থও বিনষ্ট সাধিত হয়। এই বস্তুটি কোন কিছুকে অপেক্ষা করে তা বস্তুর কাদাচিৎকত্বের দ্বারা বোঝা যায়। কাদাচিৎক বস্তু কার্য হিসাবে গণ্য হয়। কেননা কাদাচিৎক বস্তু উৎপত্তির জন্য অন্য বস্তুর প্রতি অপেক্ষা করে থাকে। তাই কাদাচিৎক বস্তু সহেতুক। প্রত্যেক কার্যের যে কারণ রয়েছে তা 'কার্যং সহেতুকং কাদাচিৎকত্বাৎ' - এই অনুমানের দ্বারা জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, এই অনিত্য বা কাদাচিৎক বস্তু উৎপত্তির জন্য যেসব বস্তুকে সবসময় অপেক্ষা করে থাকে সেই সব বস্তুকে 'কারণ' হিসাবে গণ্য করা হয়। সুতরাং বলা যায়, প্রত্যেক কার্যই কাদাচিৎক হওয়ায় কারণযুক্ত।

ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে কারণের লক্ষণ হিসেবে বলেছেন 'কার্য্যনিয়তপূর্ববৃত্তি কারণম্'[৩] অর্থাৎ কার্যের নিয়মিত পূর্বে থাকে যা, তাই কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন বস্ত্রের কারণ তন্তু। তবে তন্তুকে বস্ত্রের পূর্ববর্তী না বলে নিয়ত অব্যবহিত পূর্ববর্তী বলা উচিত। কেননা, তন্তু যদি না থাকে, তাহলে বস্ত্র উৎপাদন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তবে অন্নংভট্ট *তর্কসংগ্রহে* অব্যবহিত পূর্বে বৃত্তি বলেন নি। পরবর্তীকালে, ভাষ্যকারগণ পূর্ববৃত্তি বলতে অব্যবহিত পূর্ববৃত্তি উল্লেখ করেছেন।

প্রদত্ত লক্ষণের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে বলা হয়, অনন্যথাসিদ্ধ বিশেষণ যদি প্রযুক্ত না করা হয় তাহলে লক্ষণটিতে পটের প্রতি তন্তুরূপকে কারণ রূপে গণ্য করতে হয়। কেননা, 'কার্য্যনিয়তপূর্ববৃত্তি কারণম্' এইভাবে কারণের লক্ষণ দিলে তন্তু ও তন্তুরূপকে বস্ত্রের কারণ হিসেবে গণ্য করতে হয়। কেননা, তন্তুর সঙ্গে তন্তুরূপও থাকে। কিন্তু ন্যায় মতে তন্তুরূপকে কারণ হিসেবে গণ্য করা হয় না। তন্তুরূপকে অন্যথাসিদ্ধ হিসেবে গণ্য করা হয়। অন্যথাসিদ্ধ হল তাই যা কার্যের নিয়ত পূর্বে থাকলেও কার্য উৎপত্তির জন্য প্রয়োজনীয় নয়। এই তন্তুরূপ বস্ত্রের উৎপত্তির জন্য প্রয়োজনীয় নয় কিন্তু নিয়ত পূর্ববর্তী। সেইজন্য কারণের লক্ষণে 'অনন্যথাসিদ্ধ' বিশেষণ যুক্ত করা হয়েছে। তাই কারণের লক্ষণ হিসেবে বলা হয়েছে "অনন্যথাসিদ্ধনিয়তপূর্ববৃত্তিত্বং কারণত্বম্"[৪] অর্থাৎ যা কার্য্যের উৎপত্তির জন্য অবশ্যম্ভাবী ও কার্যের নিয়মিত পূর্ববর্তী তাই-ই কারণ হিসেবে গণ্য হয়।

ন্যায়মতে, কার্য বলতে "কার্য্যং প্রাগভাবপ্রতিযোগি"[৫] অর্থাৎ প্রাগভাবের প্রতিযোগী হল কার্য। অনিত্য বস্তুর উৎপত্তির পূর্বে তার যে অভাব তাই প্রাগভাব নামে পরিচিত। প্রাগভাবের আদি না থাকলেও অন্ত রয়েছে। যে বস্তু বা বিষয়ের অভাবের কথা বলা হয় তাই হল প্রতিযোগী। যেমন— ঘট, পট ইত্যাদির যখন অভাবের কথা বলা হয় তখন ঐ ঘট, পট হল সেই অভাবের প্রতিযোগী। ঘট, পট উৎপত্তি হলে সেই ঘট, পটের প্রাগভাব বিনষ্ট হয়।

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে তিন প্রকার কারণের কথা বলা হয়েছে। 'কারণং ত্রিবিধম্—সমবায্যসমবায়িনিমিত্ত ভেদাৎ'।[৬] যথা—১. সমবায়ি কারণ, ২. অসমবায়ি কারণ, এবং ৩. নিমিত্ত কারণ। ন্যায়মতে কার্য ভাব ও অভাব ভেদে দুইপ্রকার। সমবায়ি, অসমবায়ি ও নিমিত্ত কারণ ভাব কার্যের ক্ষেত্রে থাকে। শুধুমাত্র নিমিত্ত কারণ অভাব কার্যের ক্ষেত্রে থাকে। কেননা অভাব কার্য কোন সময় সমবায় সম্বন্ধে থাকে না।

সমবায়ি কারণের লক্ষণ দিতে গিয়ে অন্নংভট্ট বলেছেন "যৎসমবেতংকার্যমুৎপদ্যতে তৎ সমবায়িকারণম্"[৭] অর্থাৎ যাতে সমবেত হয়ে কার্য উৎপন্ন হয় তাই সমবায়ি কারণ। একমাত্র দ্রব্য পদার্থই সমবায়ি কারণ হয়। আত্মা জ্ঞান, সুখ, দুঃখের ক্ষেত্রে সমবায়ি কারণ। কেননা, জ্ঞান, সুখ, দুঃখ আত্মাতে সমবেত হয়ে আত্মায় বিশেষ গুণ উৎপন্ন হয়।

অনুরূপভাবে, তন্তুসমূহ বস্ত্রের সমবায়ি কারণ। বস্তু তার নিজের রূপের প্রতি সমবায়ি কারণ। ঘটের ক্ষেত্রে কপালদ্বয় সমবায়ি কারণ।

অসমবায়ি কারণের লক্ষণ হিসেবে অন্নংভট্ট বলেছেন, "কার্য্যেণ কারণেন বা সহৈকস্মিন্নর্থে সমবেততত্বে সতি যৎ কারণং তদসমবায়িকারণম্"[৮] অর্থাৎ কার্যের সঙ্গে বা কারণের সঙ্গে একই অধিকরণে থেকে যা কার্যকে উৎপন্ন করে, তা কার্যের অসমবায়ি কারণ। অসমবায়ি কারণ গুণ ও কর্মের মধ্যে হয়। বস্ত্রের ক্ষেত্রে তন্তু সংযোগ অসমবায়ি কারণ। অসমবায়ি কারণ বিনষ্টের মাধ্যমে কার্যদ্রব্যের বিনষ্টতা হয় এমন নিয়ম স্বীকার করা হয়। যেমন—দুটি পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুক তৈরি হয়। পরমাণু নিত্য হওয়ায় তার ধ্বংস হয় না। তাই দ্ব্যণুকের সমবায়ি কারণ পরমাণুর বিনষ্টের মাধ্যমে কার্যদ্রব্যের বিনষ্ট হয় এমন স্বীকার করা যায় না। তাই দ্ব্যণুকের অসমবায়ি কারণ পরমাণু সংযোগ বিনষ্টের মাধ্যমে কার্যদ্রব্যের বিনষ্ট হয় এমন নিয়ম স্বীকার করতে হবে।

অসমবায়ি কারণ দুই ভাবে হয়। ১. কার্যের সঙ্গে একই অধিকরণে থেকে যা কার্য উৎপন্ন কর। যেমন— তন্তু সংযোগ বস্ত্রের অসমবায়ি কারণ। ২. কারণের সঙ্গে একই অধিকরণে থেকে যা কার্য উৎপন্ন করে। যেমন—তন্তুরূপ বস্ত্ররূপের অসমবায়ি কারণ।

নিমিত্ত কারণের লক্ষণ হিসেবে অন্নংভট্ট বলেছেন "তদুভয়ভিন্নংকারণং নিমিত্তকারণম্"[৯] অর্থাৎ কার্যের সমবায়ি ও অসমবায়ি কারণ থেকে ভিন্ন কারণই হল কার্যের নিমিত্ত কারণ। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেছেন, "তুরী বেমাদিকং পটস্য"[১০] অর্থাৎ পটের ক্ষেত্রে তুরী, বেমা, তাঁতি হল নিমিত্ত কারণ। এছাড়া ঈশ্বর, ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের প্রযত্ন, ঈশ্বরের জ্ঞান, দিক, কাল, অদৃষ্ট, তৎ তৎ কার্যের প্রাগভাব—যে কোন কার্যের সাধারণ নিমিত্ত কারণ হিসেবে নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন। সাধারণভাবে কার্যের কর্তা ও তাঁর সহকারী বিষয়সমূহ নিমিত্তকারণ হিসেবে গণ্য হয়। এদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কার্যটি উৎপন্ন হয়ে থাকে। পটের ক্ষেত্রে তুরী, বেমা, তাঁতি ইত্যাদি নিমিত্তকারণকে অসাধারণ নিমিত্ত কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

নিমিত্ত কারণ না থাকলে তাকে নির্নিমিত্তক বলা হয়। অনেক দার্শনিক মনে করেন জগতে অবস্থিত ঘট, পট প্রভৃতি অনিত্য পদার্থের নিমিত্ত কারণ স্বীকার করা হলেও প্রস্তরের কাঠিন্য, কন্টকের তীক্ষ্ণতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিমিত্তকারণ স্বীকার করা যায় না। এক্ষেত্রে প্রস্তর, কন্টকের অবয়বরূপ কারণ স্বীকার করা হয়।

তাই বলা যায়, শুধুমাত্র আকস্মিক কারণের জন্যই নয় অনেক ক্ষেত্রেই নিমিত্ত কারণ ছাড়া কার্য করতে পারে। নৈয়ায়িকগণ মনে করেন, নিমিত্ত কারণের প্রত্যক্ষ না হলেই বলা উচিত না সেই কার্যটি নিমিত্ত কারণ ছাড়াই ঘটেছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা নিমিত্তকারণের জ্ঞান না হলে সেটা সন্দিগ্ধ হতে পারে। ঘট ও পর্বত উভয়ই কার্য পদার্থ বা জন্য পদার্থ হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কুম্ভকারাদি হল ঘটের নিমিত্ত কারণ যাকে প্রত্যক্ষ করা যায়, অন্যদিকে পর্বতের ক্ষেত্রে নিমিত্তকারণকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। নিমিত্ত কারণ যেসব ক্ষেত্রে সন্দিগ্ধ, সবাই কিন্তু সেক্ষেত্রে কার্য অবয়বীর অবয়বের মিলনকে স্বীকার করেন। অবয়বগুলি অচেতন হওয়ায় নিজেরা মিলিত হয়ে কার্য সাধন করতে পারে না। চেতনের দ্বারাই সেগুলি কার্য সাধন করে থাকে। পূর্বে যে উদাহরণগুলি দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ প্রস্তরের কাঠিন্য, কন্টকের তীক্ষ্ণতা প্রভৃতির অবয়বগুলি নিজেই প্রবৃত্ত হয়ে কার্যসাধন করতে পারে না। তারা নিমিত্তকারণের অপেক্ষায় থাকে। সকল জন্য পদার্থই নিমিত্ত কারণ বিশিষ্ট যেমন ঘট, পট ইত্যাদি। সুতরাং বলা যায়, প্রত্যেক কার্য কর্তৃ সাপেক্ষ। এই জগতের কর্তৃরূপে ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয়। সমবায়ি ও অসমবায়ি কারণ থেকে ভিন্ন হওয়ায় ঈশ্বর নিমিত্ত কারণরূপে অভিহিত হয়।

ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকগণ বহমান বিশ্বের উৎপত্তির পূর্বে একটি বিশ্ব ছিল বলে মনে করেন। তাঁরা আরও মনে করেন সেই বিশ্বের প্রলয়ের পরে এই বিশ্বের উৎপত্তি হয়েছে। তাই তাঁরা বলেন এই সৃষ্টির প্রক্রিয়া অনাদি। তাঁরা মনে করেন, সৃষ্টির পূর্বে প্রলয়, প্রলয়ের পরে সৃষ্টি—এইভাবে চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে। জীবের মুক্তি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে প্রবাহিত হতে হয়। প্রলয়ের ফলে জীবের বিশ্রাম হয় কিন্তু জীবের আত্মাতে কর্মগুলি সংস্কাররূপে থেকে যায়। ফলে ঈশ্বর তাঁদের কর্ম ও সংস্কার অনুসারে কর্মফল ভোগের জন্য জগতের উৎপত্তির ইচ্ছা পোষণ করেন। ফলে পরমাণু সমুহে স্পন্দন উৎপন্ন হয়। সৃষ্টিলগ্নে জীবের আত্মাতে কর্মসমূহ সংস্কার রূপে সঞ্চিত অদৃষ্ট এবং পরমাণুর স্পন্দনকে সহকারি হিসেবে গ্রহণ করে ঈশ্বরের প্রযত্ন দ্বারা চারটি পরমাণু সমূহে অর্থাৎ ক্ষিতি,

অপ্, তেজ্, মরুৎ-এ ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। দুটি সমজাতীয় পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুকের উদ্ভব হয়। দুটি সমজাতীয় ক্ষিতি পরমাণুর সংযোগে ক্ষিতি অর্থাৎ পার্থিব দ্ব্যণুকের উদ্ভব হয়। অন্যান্য পরমাণুগুলোর একইভাবে দ্ব্যণুকরূপ কার্যের উৎপন্ন হয়। এই কার্যের ক্ষেত্রে পরমাণু হল সমবায়ি কারণ, পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ হল অসমবায়ি কারণ। নিমিত্তকারণ হল ঈশ্বর, ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের প্রযত্ন, ঈশ্বরের জ্ঞান, দিক, কাল, প্রাগভাব, অদৃষ্ট, প্রতিবন্ধকাভাব। এরপর ঈশ্বরের প্রযত্ন ও জীবের অদৃষ্ট অনুযায়ী দ্ব্যণুকসমূহে পুনরায় ক্রিয়া উৎপন্ন করেন। ফলে সমজাতীয় তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগে ত্র্যণুক উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ, সমজাতীয় তিনটি ক্ষিতি অর্থাৎ পার্থিব দ্ব্যণুক পরস্পর যুক্ত হয়ে পার্থিব ত্র্যণুকের উদ্ভব হয়। অনুরূপভাবে, অন্য পরমাণুগুলিও যুক্ত হয়ে ত্র্যণুকের উদ্ভব হয়। এক্ষেত্রে সমবায়ি কারণ হল দ্ব্যণুক, অসমবায়ি কারণ হল তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগ এবং নিমিত্ত কারণ হল ঈশ্বর সহ পূর্বোক্ত নয়টি কারণ। আবার ত্র্যণুকে ক্রিয়া উৎপন্ন হলে সমজাতীয় চারটি ত্র্যণুক পরস্পর যুক্ত হয়ে চতুরণুক উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে একইভাবে সমবায়ি কারণ হল চারটি ত্র্যণুক, অসমবায়ি কারণ হল চারটি ত্র্যণুকের সংযোগ, নিমিত্ত কারণ হল ঈশ্বর সহ নয়টি কারণ। একইভাবে চতুরণুক সংযুক্ত হয়ে পঞ্চাণুকের উদ্ভব হয়। অনুরূপভাবে পঞ্চাণুক থেকে ষড়ণুক উৎপন্ন হয়। একইভাবে পূর্ববর্তী কারণ থেকে স্থূল, স্থূলতর, স্থূলতম কার্য দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। এইভাবে মহৎ ক্ষিতি, মহৎ অপ্, মহৎ তেজ্, মহৎ মরুৎ উৎপন্ন হয়ে থাকে। 'কারণগুণা হি কার্যগুণা নারভন্তে'-কারণগুণ কার্যগুণকে উৎপন্ন করে। এই নিয়ম পরমাণু- দ্ব্যণুক- ত্র্যণুক এইভাবে চলতেই থাকে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় জীবের অদৃষ্ট জনিত ভোগ সম্পন্ন করার জন্য স্থূল জগতের সৃষ্টি হয়েছে।[১১]

ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে 'কাল' কে সাধারণ নিমিত্তকারণ হিসেবে গণ্য করেছেন। কাল এক, নিত্য ও বিভু দ্রব্য। কালে সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ গুণ থাকে। কালের লক্ষণ হিসেবে বলা হয়েছে-"অতীতাদি-ব্যবহার-হেতুঃ কালঃ"[১২] অর্থাৎ যে দ্রব্য অতীত, বর্তমান, ও ভবিষ্যতের ব্যবহারের হেতু তাই কাল। কালে উদ্ভূতরূপ বা স্পর্শ নেই এবং বিভু পরিমাণ বিশিষ্ট হওয়ায় কালের প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। অতীতাদি ব্যবহারের কারণ হিসেবে এর অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। এই কালকে দিক ও ঈশ্বর ছাড়া সকল উৎপত্তি বিনাশশীল পদার্থের জনক হিসেবে গণ্য করা হয়। এই জগতের আধার হচ্ছে কাল এবং প্রতিটি কার্যের নিমিত্তকারণ। কেননা, সকল পদার্থ কালিক সম্বন্ধে কালে থাকে। কাল যদি না থাকত, তাহলে কোন অনিত্য পদার্থের উৎপত্তিই হতো না। যারা সৎ বা নিত্য, তাদের উৎপত্তি হয় না, যেমন আকাশ ইত্যাদি। যা একদম অসৎ তাদেরও উৎপত্তি হয় না যেমন শশশৃঙ্গ ইত্যাদি। কিন্তু যেসব বস্তু উৎপত্তির পূর্বে থাকে না কিন্তু উৎপত্তি হলে থাকে এবং যার পরবর্তীতে ধ্বংস সাধিত হয়, কাল না থাকলে এদের উৎপত্তিই সম্ভব হত না। তাই একে সাধারণ নিমিত্ত কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়।[১৩]

নৈয়ায়িকগণ দিককেও সাধারণ নিমিত্তকারণ হিসেবে গণ্য করেছেন। আচার্য অন্নংভট্ট দিকের লক্ষণ হিসাবে বলেছেন "প্রাচ্যাদি-ব্যবহার-হেতুঃ।"[১৪] এক্ষেত্রে প্রাচ্যাদির যে আদি পদ- তা প্রতীচী (পশ্চিম), উদীচী (উত্তর), অবাচী (দক্ষিণ) রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। তাই বলা যায় যে দ্রব্য পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ প্রভৃতি ব্যবহারের কারণ তা দিক হিসাবে গণ্য হয়।

দূরত্ব ও নিকটত্ত্বের ব্যাখ্যা দিকের দ্বারা করা যায়। আগে প্রাপ্ত স্থান তা নিকট হিসেবে পরিচিত এবং পরে প্রাপ্ত স্থান দূর হিসেবে গণ্য হয়। অপরত্ব যা নিকট তাতে থাকে এবং পরত্ব যা দূর তাতে থাকে। পরত্ব এবং অপরত্ব কার্য হিসেবে গণ্য হয় যেহেতু তা উৎপন্ন বা জন্য পদার্থ। দৈশিক অপরত্ব ও পরত্বের উপপত্তির জন্য দিক নামক দ্রব্যে অনুমিত হয়ে থাকে। আকাশের মত এই দিক এক, নিত্য ও বিভু। দিক এক হলেও পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ প্রভৃতি উপাধি ভেদে নানারূপে ব্যবহারের বিষয় হয়ে থাকে। এর মধ্যে উদয়াচলের সম্মুখে স্থিত শরীরের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত দেশ হল দক্ষিণ দিক, সম্মুখ দিকে অবস্থিত দেশ পূর্বদিক, পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত দিক হলো পশ্চিম দিক, বাম দিকে অবস্থিত দেশ উত্তর দিক। এইভাবে দশটি উপাধি ভেদে দশটি দিকের ব্যবহার হয়। দক্ষিণে নারিকেল চাষ হয়, উত্তরে রেশম উৎপন্ন হয়। এইভাবে দিক সমস্ত কার্যের অধিকরণ বলে সমস্ত কার্যের নিমিত্ত কারণ হিসেবে গণ্য হয়।[১৫]

প্রাগভাবকেও একটি সাধারণ নিমিত্ত কারণ হিসেবে ন্যায়-বৈশেষিকগণ স্বীকার করে থাকেন। ঘট প্রভৃতি কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে প্রাগভাব ও অন্যান্য কারণসমূহ উপস্থিত থাকলে কার্য উৎপন্ন হয়। সেইজন্য সকল কার্যের প্রতি প্রাগভাব সাধারণ নিমিত্ত কারণ। কোন বস্তুর উৎপত্তির পূর্বে তার উপাদান কারণে তার যে অভাব, তাকে প্রাগভাব বলে। কার্য উৎপত্তির অর্থই হচ্ছে তার প্রাগভাব নষ্ট হয়ে যাওয়া। প্রাগভাবকে কারণ হিসাবে গণ্য না করলে পুনরুৎপত্তির

আপত্তি ওঠে। কেননা প্রাগভাবকে কারণ হিসাবে গণ্য না করলে ঘট, পট ইত্যাদি রূপ কার্যের ক্ষেত্রে সমস্ত কারণ উপস্থিত থাকে, ফলে আবার কার্যের পুনরুৎপত্তির বিষয়টি উঠে আসবে। কিন্তু প্রাগভাবকে কার্যের কারণ হিসাবে গণ্য করলে এই আপত্তি উঠবে না। যেহেতু কার্যের উৎপত্তির ক্ষণে অন্যান্য কারণ থাকে কিন্তু কার্য উৎপত্তির ক্ষণে প্রাগভাব থাকে না। কেননা প্রাগভাব বিনষ্ট হয়েই কার্যের উদ্ভব হয়। তাই অন্যান্য কারণ থাকা সত্ত্বেও প্রাগভাবের অভাব থাকায় পুনরায় কার্য উৎপত্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না। প্রাচীন ন্যায় এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রাগভাব ছাড়া অন্যান্য কারণগুলো নিত্য হওয়ায় তারা কার্য উৎপত্তির পূর্বে ও পরে উপস্থিত থাকে। নব্যগণ এইরূপ যুক্তিকে স্বীকার করেন না। তাঁরা মনে করেন নিজের উৎপত্তির প্রতি ঘটাদি বস্তুই প্রতিবন্ধক হয়ে পড়ে। কপালে সমবায় সম্বন্ধে ঘট থাকে, এই ঘটই কপালে অর্থাৎ উপাদান বা সমবায়ি কারণে ঘটরূপ কার্যে পুনরুৎপত্তির প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে প্রাচীনগণের বক্তব্য হল যখন ঘট উৎপন্ন হয় তখন সেই ঘটের প্রাগভাব তার বিনষ্টের কারণের অভাবের ফলে ঘটের পুনরুৎপত্তি অসম্ভব হয়ে ওঠে। ফলে নব্যগণকেও প্রাগভাব স্বীকার করে নিতে হয়।[১৬]

ন্যায়দর্শনে অদৃষ্ট স্বীকার করা হয়েছে। এই অদৃষ্ট সাধারণ নিমিত্ত কারণ হিসেবে গণ্য হয়। ন্যায়দর্শনে অদৃষ্ট শব্দের দ্বারা ধর্ম ও অধর্ম উভয়কেই বোঝানো হয়েছে। বেদে যেসব কর্ম করার কথা বলা হয়েছে, সেই কর্ম সাধনের ফলে আত্মায় যে গুণ বিশেষের উৎপত্তি হয় তাকে ধর্ম বলা হয়। এই ধর্ম নামক গুণ লৌকিক মানস প্রত্যক্ষের দ্বারা জানা না গেলেও তা স্থায়ী হয়। এই গুণ জীবাত্মার মোক্ষ ও সুখের হেতু হয়, যা জীবাত্মার অত্যন্ত প্রিয় একটি গুণ বিশেষ। কিন্তু এই প্রিয় গুণ বিশেষ নিত্য নয়। কেননা, কোন ধর্ম সাধনের ফলে যে সুখ পাওয়া সম্ভব, সেই সুখ পাওয়া সম্পূর্ণ হলেই তা ধ্বংস হয়ে যায়।

শ্রী কেশব মিশ্র তাঁর *তর্কভাষায়* বলেছেন "সুখাহসাধারণকারণং ধর্মঃ"[১৭] অর্থাৎ ধর্ম হচ্ছে সুখের অসাধারণ কারণ। অধর্ম সম্পর্কে বলেছেন "দুঃখাহসাধারণকারণম্ অধর্মঃ"[১৮] অর্থাৎ অধর্ম দুঃখের অসাধারণ কারণ। ধর্ম, অধর্মের লক্ষণে 'অসাধারণ' পদ যুক্ত হওয়ায় অতিব্যাপ্তি দোষ থেকে মুক্ত হয়েছে। লক্ষণ যদি অলক্ষ্যে বৃত্তি হয় তাহলে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। যেমন- গরু শৃঙ্গবিশিষ্ট, অনেক প্রাণী আছে যারা শৃঙ্গবিশিষ্ট কিন্তু গরু নয়। এক্ষেত্রে লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যাওয়ায় অতিব্যাপ্তি দোষ হবে।

আবার বলা যায় কামজ পুরুষ তার স্ত্রী বা বান্ধবীর দর্শন-স্পর্শনের মাধ্যমে যে সুখ লাভ করে তার অসাধারণ কারণ হিসেবে দর্শন-স্পর্শনাদিকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে দর্শন ও স্পর্শন সুখের অসাধারণ কারণ হওয়ায় আবার অতিব্যাপ্তি দোষে দোষযুক্ত হয়ে পড়ে। এই দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য জাতি ঘটিত লক্ষণকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, "যাগজন্যস্বর্গজনকবৃত্তিগুণত্বব্যাপ্য জাতিমান ধর্মঃ" অর্থাৎ যে বস্তু যাগ থেকে উৎপন্ন হয়ে স্বর্গের জনক হয়, তাতে গুণত্ব জাতির ব্যাপ্য ধর্মত্ব জাতি থাকে, সেই জাতিবিশিষ্ট গুণই হল ধর্ম। ধর্ম অনিত্য, কেননা তা উৎপত্তি বিনাশশীল। আত্মা হল ধর্মের সমবায়ি কারণ, আত্ম মনঃ সংযোগ হচ্ছে অসমবায়ি কারণ। জপ, তপ, তীর্থস্থানে গমন, দেবদর্শন, যাগ, দান হচ্ছে নিমিত্তকারণ। ধর্ম অতীন্দ্রিয় তাই জপ, তপ, যাগ, দান ইত্যাদি ব্যাপার হিসেবে কল্পনা করা হয়। ব্যাপার রুপে কল্পনা করা না হলে স্বর্গরূপ ফলের জনকরূপে যাগ, দান ইত্যাদিকে স্বীকার করা যেত না।[১৯] অদৃষ্ট স্বীকারের কারণ আলোচনার সময় এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

বেদে যেসব কর্ম নিষিদ্ধ রূপে গণ্য করা হয়েছে সেই সব কর্ম সাধনের ফলে আত্মায় যে গুণ বিশেষের উৎপন্ন হয় তাকে অধর্ম বলে। যে কর্ম বেদে নিষিদ্ধ তাদের মধ্যে হিংসা, মিথ্যা বলা, চুরি করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এইসব কর্মের ফলেই অধর্মের উৎপত্তি হয়। অধর্মও অতীন্দ্রিয়। ফলে মানস প্রত্যক্ষের দ্বারা জানা যায় না। এই অধর্মের ফলেই দুঃখ ও পাপের উদ্ভব হয়। অধর্মের ফলে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তা উপভোগ করা হলে অধর্ম বিনষ্ট হয়ে যায়। পূর্বে অধর্মের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছিল তা হল "দুঃখাহসাধারণকারণম অধর্মঃ" অর্থাৎ অধর্ম হল দুঃখের অসাধারণ কারণ। এই লক্ষণেও অতিব্যাপ্তি দোষ দেখা দেয়। কেননা কণ্টক সংযোগ, শূল, জ্বর ইত্যাদিও দুঃখরূপ কার্যের অসাধারণ কারণ হয়। ফলে অধর্মের লক্ষণে সমন্বয় হয়ে যায়। এই অতিব্যাপ্তি দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বলা হয় "নিষিদ্ধকর্মজন্যনরকজনকবৃত্তিগুণত্বব্যাপ্যজাতিমান্ অধর্মঃ"। যে বস্তু নিষিদ্ধকর্ম থেকে উৎপন্ন হয়ে নরকের জনক হয় তাতে গুণত্বব্যাপ্য জাতির ব্যাপ্য অধর্মত্ব জাতি থাকে, সেই জাতি বিশিষ্ট গুণই অধর্ম। অধর্মও অনিত্য। এই অধর্মের আত্মা হচ্ছে সমবায়ি কারণ, আত্ম-মন সংযোগ হচ্ছে অসমবায়ি কারণ এবং নিমিত্ত কারণ হচ্ছে হিংসা, মিথ্যা বলা, চুরি করা ইত্যাদি রূপ কর্ম।[২০]

ঈশ্বর, তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষে মিথ্যাজ্ঞানের ফলে বাসনা তৈরি না হওয়ায় ধর্মাধর্মের উৎপত্তি হয় না। অর্থাৎ, ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞানীপুরুষে সুখ-দুঃখরূপ ফল উৎপন্ন হয় না। এই ধর্ম ও অধর্ম অনুমান ও আগম প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়ে থাকে।

ন্যায়কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে ঈশ্বর নিরূপণ বিষয়ে পাঁচ প্রকার বিপ্রতিপত্তির কথা বলা হয়েছে। প্রথম বিপ্রতিপত্তি 'অলৌকিকস্যপরলোকসাধনস্যাভাবাৎ'-এ চার্বাক মত উপস্থাপিত হয়েছে। এ বাক্যকে অলৌকিকস্যাভাবাৎ, পরলোকস্যাভাবাৎ ও সাধনস্যাভাবাৎ এই তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। চার্বাক মতে জ্ঞানলাভের একমাত্র পথ প্রত্যক্ষ। তাই যা প্রত্যক্ষ বহির্ভূত তা স্বীকার করা যায় না। তাই পরলোক বা তার সাধনভুত ধর্ম ও অধর্ম স্বীকার করেন না। সেই জন্য 'অলৌকিক স্যাভাবাৎ' অর্থাৎ অলৌকিক ধর্ম অধর্মাদি থাকে না এবং 'পরলোকস্যাভাবাৎ' অর্থাৎ মৃত্যু পরবর্তী স্বর্গাদি না থাকায় ঈশ্বরেরও স্বীকার করা যায় না। কেননা ধর্ম অধর্মাদি ও স্বর্গাদি অধিষ্ঠাতা রূপে ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয় না। এছাড়া 'সাধনস্যাভাবাৎ' অর্থাৎ কার্যকারণ ভাব চার্বাকগণ স্বীকার করেন না। তাই বলতে হবে জগত বিনা কারণে উৎপন্ন হওয়ায় ঈশ্বর স্বীকারের কোন যৌক্তিকতা নেই। চার্বাকগণ স্বভাববাদ বা আকস্মিকতাবাদ এর মাধ্যমে জগতের যাবতীয় বস্তুর ব্যাখ্যা করে থাকেন। সুতরাং ধর্মাধর্ম স্বীকার, পরলোকের স্বীকার, জগতের উৎপত্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে চার্বাকগণ ঈশ্বর স্বীকার করেন না। নৈয়ায়িকগণ চার্বাকগণের মত স্বীকার করেন না। নৈয়ায়িকগণ বিভিন্ন কারণে ঈশ্বর স্বীকার করে থাকেন। (ক) জগতের নির্মাণকর্তা রূপে, (খ) কর্মানুসারে জীবের ফলপ্রদান কর্তারূপে অর্থাৎ ধর্মাধর্ম রূপ অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতারূপে, (গ) বেদের উপদেষ্টা রূপে। এর মধ্যে ঈশ্বরের জগৎ কারণত্ব ও অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা রূপে - এই দুটি বিষয় কার্যকারণ ভাবের দ্বারা প্রভাবিত।[২১]

ন্যায় দর্শন স্বীকৃত অদৃষ্টরূপ ধর্ম ও অধর্ম স্বীকার করার পশ্চাতে যেসব যুক্তি আচার্য উদয়ন তাঁর *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি* গ্রন্থে দিয়েছেন সেগুলি আলোচনা করা হবে।

সাপেক্ষত্বাদনাদিত্বাদ বৈচিত্র্যাদ বিশ্ববৃত্তিতঃ।
প্রত্যাত্মনিয়মাদ্ ভূক্তেরস্তি হেতুর লৌকিকঃ।। ৪।।[২২]

এই যুক্তিগুলি নিম্নে আলোচনা করা হলো—

সাপেক্ষত্ব হলো প্রথম হেতু। এই হেতুর অর্থ হল কাদাচিৎকত্ব। এই কাদাচিৎকত্বের দ্বারাই কার্যের সাপেক্ষত্ব সিদ্ধ হয়। সাপেক্ষ শব্দের অর্থ হলো যা কোন কিছুকে অপেক্ষা করে থাকে। প্রত্যেক কার্যের কারণ আছে। তাই প্রত্যেক কারণ কার্যসাপেক্ষ। তাই বলা হয় "কার্যং সহেতুকং সাপেক্ষত্বাৎ"। বরদরাজ হলেন 'বোধনী' টীকাকার। তিনি মনে করেন, সাপেক্ষত্ব কাদাচিৎকত্বের দ্বারা সিদ্ধ হয় এবং এর দ্বারা সহেতুকত্ব সিদ্ধ হয়। গুণানন্দ মনে করেন সাপেক্ষত্ব হল প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ব। বর্ধমানোপাধ্যায়, যিনি 'প্রকাশ' রচনা করেছিলেন, তিনি মনে করেন সাপেক্ষত্বই কাদাচিৎকত্ব। যা সবসময় থাকে না তাই হলো কাদাচিৎক। অর্থাৎ কোন সময়ে থাকে আবার কোন সময়ে থাকে না। যেমন ভোজনের ফলে তৃপ্তি হয় আবার পরবর্তীতে ক্ষুধা লাগে। অর্থাৎ ভোজন করলে তৃপ্তি হয় --এটা সবসময় থাকে না। তাই বলা হয়, ভোজনের ফলে যে তৃপ্তি হয় তা সহেতুক এবং কাদাচিৎক। যখন ভোজন করা হয় তখন তৃপ্তি হয়, তাই বলা হয় কারণ থাকলেই কার্য হয়। কারণের মত কার্যও কাদাচিৎক ও সহেতুক হয়। কেননা যখন ভোজন করা হয়, তখন তৃপ্তি হয়, কিন্তু সেই তৃপ্তি সময়ের ব্যবধানে থাকেনা। এগুলি উপনয় এবং নিগমন। কার্যের সহেতুকত্ব উক্ত পঞ্চাবয়ব যুক্ত অনুমান বাক্য থেকে সিদ্ধ হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, নিত্য ও অলীক বস্তু কাদাচিৎক হয় না এবং এদের সহেতুকও বলা যায় না। কেননা, নিত্যবস্তু সব সময় থাকে এবং অলীক বস্তু কোন কালেই থাকে না।[২৩]

পূর্বপক্ষী চার্বাকগণ বলতে পারেন, নৈয়ায়িকগণ যেহেতু কার্যকারণ সম্পর্ক স্বীকার করেন, তাহলে কারণ নিত্য বা অনিত্য হবে- এমন বলতে হবে। যদি কারণ নিত্য হয় তাহলে কার্য যথা- ঘট, পট ইত্যাদিও নিত্য হবে। কিন্তু ঘট পটকে নিত্য বলা যায় না। তাই ঘট, পট ইত্যাদির কারণকেও নিত্য বলা যায় না। বলা যায় ঘট, পট ইত্যাদির কারণের উৎপত্তি স্বীকার করতে হবে। ফলে সেই কারণেরও কারণ স্বীকার করতে হবে। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় কারণের ক্ষেত্রেও নিত্য ও অনিত্যের বিষয় আসবে। ফলে একই অবস্থা হবে। অনুরূপভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয়াদি কারণাদির ক্ষেত্রে একই ভাবে নিত্য ও অনিত্যের প্রসঙ্গ আসবে। এইভাবে চলতেই থাকবে। ফলে অনাবস্থা দোষ অনিবার্য। ফলে কারণের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হবে না।[২৪]

এই সমস্যা সমাধানকল্পে আচার্য উদয়ন বলেছেন 'অনাদিত্বাৎ'। ব্যক্তিগত ও প্রবাহরূপে—এই দুই ভাবে অনাদি হতে পারে। আত্মা, আকাশ ইত্যাদির কোন আদিক্ষণ না থাকায় ব্যক্তিগতভাবে অনাদি। অন্যদিকে ব্যক্তিগতভাবে বীজাঙ্কুরের ক্ষেত্রেও যে অনাবস্থা হয়, সেই অনাবস্থা ব্যক্তিগতভাবে সাদি কিন্তু প্রবাহরূপে অনাদি। বীজাঙ্কুর প্রবাহ রূপে অনাদি যেহেতু দুটির মধ্যে কারো ইদম্ প্রাথম্য থাকে না। কিন্তু বীজ ও অঙ্কুরের ক্ষেত্রে যে অনাবস্থার সৃষ্টি হয় অর্থাৎ বীজ থেকে অঙ্কুর হয়। এক্ষেত্রে বীজ অঙ্কুরের কারণ। আবার এই অঙ্কুর থেকেই বীজ হয়। এইভাবে চলতে থাকে। ফলে অনাবস্থা অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই কার্যকারণভাব অনাদি হয় তবে তা প্রবাহরূপে হয়। এই অনাবস্থা প্রামাণিক হওয়ায় তা দোষাবহ হয় না। অনুরূপভাবে, পূর্বপক্ষীগণ যে অনাবস্থার কথা দেখিয়েছেন তা প্রামাণিক অনাবস্থা হওয়ায় দোষবহ নয়।[২৫]

চার্বাক সম্প্রদায় আবার বলেন কারণ স্বীকার করা হলেও অদৃষ্ট কারণ স্বীকার করতে এবং ঈশ্বরের সিদ্ধি করতে পারে না। বেদান্ত মতে মনে করা হয় এক ব্রহ্ম থেকে অজ্ঞানবশত জগৎ ও জগতের বিভিন্ন বস্তুর উদ্ভব হয়। আবার সাংখ্য মতে এক জাতীয় প্রকৃতি থেকে বিভিন্ন ধরণের কার্য উৎপন্ন হয়। তাহলে সকল কার্যের ব্যাখ্যা প্রদান করার জন্য এক বা এক জাতীয় বস্তুকে কারণ হিসেবে স্বীকার করা হোক। এর উত্তরে আচার্য উদয়ন বলেছেন "বৈচিত্র্যাৎ"। এক্ষেত্রে যে অনুমান করার কথা বলা হয় "কার্যং বিচিত্রকারণবৎ বিচিত্রকার্যত্বাৎ" অর্থাৎ কার্যের বিচিত্র কারণ রয়েছে, যেহেতু কার্য বিচিত্র রকমের। বিভিন্ন জাতীয় কার্যের জন্য বিভিন্ন কারণকে স্বীকার করতে হবে। এই বিচিত্র কারণ 'বৈচিত্র্যাৎ' হেতুর দ্বারা প্রমাণ করা হচ্ছে। অদৃষ্টই বিচিত্র কারণ হয়। তাই বেদান্ত মতে এক ব্রহ্ম থেকে বিচিত্র কার্য উৎপন্ন হতে পারে না। অনুরূপভাবে সাংখ্য মতে এক জাতীয় প্রকৃতি থেকে বিভিন্ন কার্য উৎপন্ন হতে পারে না।[২৬]

চার্বাকগণ পুনরায় বলেন জগতের কার্যের জন্য বিভিন্ন প্রত্যক্ষসিদ্ধ কারণ স্বীকার করা যায়। এর জন্য অলৌকিক অপ্রত্যক্ষসিদ্ধ অদৃষ্টাদি স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। তাঁরা বিভিন্ন কার্যের কারণ হিসাবে যাগাদিকেই কারণ বলতে চায়। অগ্নিষ্টোম যাগ, জ্যোতিষ্টোম যাগ ভেদে বিভিন্ন প্রকার হয়। ফলে বিভিন্ন কারণ থেকে বিভিন্ন কার্যের উৎপত্তি হতে পারে। ফলে অদৃষ্ট স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। এর উত্তরে আচার্য উদয়ন বলেছেন 'বিশ্ববৃত্তিতঃ' হেতুটি। সাধু ব্যক্তি পারলৌকিক ফল লাভের আশায় যাগাদি-কর্মে প্রবৃত্ত হয়। শ্রুতিতে বলা হয়েছে "জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত"। এক্ষেত্রে স্বর্গের কারণ হিসেবে যাগাদিকে গ্রহণ করা হয়েছে। যাগাদিক্রিয়া সম্পন্ন করার পর পরই স্বর্গে উপনীত হওয়া যায় না। ক্ষণস্থায়ী যাগাদিক্রিয়া সম্পাদনের বহু পরবর্তীকালে স্বর্গাদি ফল উৎপন্ন করে। তাই যাগাদি ক্রিয়াকে স্বর্গাদি ফলের কারণ হিসাবে গণ্য করা যায় না, কেননা কারণ হতে গেলে তাকে কার্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী হতে হবে। যাগাদিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেইজন্য যাগাদি ক্রিয়া ও স্বর্গলাভের মধ্যে এক ব্যাপার স্বীকার করতে হয়। যাকে ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকগণ 'অদৃষ্ট' বলে মনে করেন। এই ব্যাপারকে মীমাংসক দার্শনিকগণ 'অপূর্ব' বলে উল্লেখ করেছেন। ন্যায় দর্শনে ব্যাপার হল "তজ্জন্যতে সতি তজ্জন্যজনকত্বম্" অর্থাৎ কারণের দ্বারা উৎপন্ন এবং কারণের দ্বারা উৎপন্ন কার্যের জনক। এক্ষেত্রে অদৃষ্ট ব্যাপার হিসাবে পরিগণিত হয়। অদৃষ্ট হল একপ্রকার শক্তি যা কারণের মধ্যে অপ্রত্যক্ষিত হয়ে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বিরাজ করে। এই অদৃষ্টরূপ ব্যাপার স্বর্গের কারণ হয়। প্রকৃতপক্ষে কর্ম ও কর্মফলের মধ্যবর্তী হল এই অদৃষ্ট। এর সঙ্গে স্মৃতির তুলনা করা যেতে পারে। যেমন- পূর্বানুভব হলে সেই বিষয়ে স্মৃতি হয়। এক্ষেত্রে পূর্ব অনুভবকর্তা এবং স্মৃতিকর্তা এক হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এই পূর্বানুভবকে স্মৃতির কারণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে না। কেননা, পূর্বানুভব স্মৃতির বহুপূর্বে নষ্ট হয়ে যায়। সেইজন্য অনুভব ও স্মৃতির মধ্যে অনুভবজনিত সংস্কারকে ব্যাপাররূপে স্বীকার করা হয়। সুতরাং যাগাদিকর্ম অদৃষ্ট ব্যাপারের স্বজন্যদৃষ্টবত্তা সম্বন্ধে স্বর্গাদি ফলের কারণ হিসাবে গণ্য করা হয়।[২৭]

চার্বাকগণ পুনরায় আপত্তি করে বলেন নৈয়ায়িকগণ আত্মাতে স্থিতধর্ম হিসেবে অদৃষ্টকে স্বীকার করেন। ফলে নৈয়ায়িক সম্মত অদৃষ্টের সিদ্ধি হয় না। কিন্তু চার্বাক মতে একটি বস্তু একজনের কাছে সুখজনক হলে তা সকলের কাছে সুখজনক হবে। কেননা তাঁরা মনে করেন ভোগ্যবস্তুতে ভোগজনক সংস্কার বা ধর্ম থাকে। তাই সকলের কাছে সমানরূপে প্রতিভাত হয়। এই প্রসঙ্গে উদয়নাচার্য বলেছেন "প্রত্যাত্মনিয়মাদ্ ভূক্তেঃ" অর্থাৎ সুখ-দু:খান্যতর সাক্ষাৎকাররূপ ভোগ আত্মা ভেদে ভিন্নতা হয়। তাই বলা হয় অদৃষ্ট ভোগ্যবস্তুর ধর্ম নয়, আত্মনিষ্ঠ ধর্ম। সেইজন্য একটি বস্তু একজনের কাছে সুখদায়ক, সেই একই বস্তু অন্যজনের কাছে দুঃখজনক হতে পারে। ভোগ্য পদার্থে অদৃষ্টকে স্বীকার করলে জগতের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যে ভোগের বৈচিত্র্য দেখা যায় যেমন কেউ সুখী, কেউবা দুঃখী, কেউ

রাজভোগে রত, কেউ উপবাসে রয়েছে - এইসব ব্যাখ্যা করা যায় না। সব আত্মা সকল ভোগ্য পদার্থকে ভোগ করতে পারে না। তাই বলা যায় অদৃষ্ট ভোগ্যনিষ্ঠ না হয়ে আত্মনিষ্ঠ হয়, নিজ নিজ কর্মাধীন। আত্মনিষ্ঠ অদৃষ্ট স্বীকার করা হয় ভোগের বৈচিত্র্যবশত।[২৮]

ন্যায়দর্শন সম্মত কর্মসাপেক্ষ ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ সেই বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

মহর্ষি গৌতম তাঁর *ন্যায়সূত্রে* প্রমেয় পদার্থ হিসাবে আত্মার বা জীবাত্মার কথা উল্লেখ করলেও পরমাত্মা হিসাবে ঈশ্বরের উল্লেখ করেননি। তাহলে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে অপবর্গ বা মুক্তি লাভের জন্য কি ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা নেই। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় প্রমেয় পদার্থ হিসাবে উল্লেখিত আত্মারই অন্তর্গত ঈশ্বর। কেননা আত্মা দুই প্রকার- জীবাত্মা বা জীব ও পরমাত্মা বা ঈশ্বর। এই দুই প্রকার আত্মার কথা পরবর্তী ন্যায়- বৈশেষিক দার্শনিকগণ পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন। মহর্ষি গৌতম *বাৎস্যায়নভাষ্যের* চতুর্থ খন্ডে ঈশ্বর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মহর্ষি গৌতম চতুর্থ অধ্যায়ে বলেছেন "ঈশ্বরঃ কারণং, পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শণাৎ"[২৯] অর্থাৎ পুরুষের (জীব) কর্মের ফলপ্রাপ্তি না হওয়ায় ঈশ্বরকেই কারণ হিসাবে গণ্য করা হয়। কেননা, জীবের কর্মের ফলপ্রাপ্তি না হওয়ায় জীবের ফলপ্রাপ্তিকে স্বাধীন বলে মনে করা হয় না, তা পরাধীন বলে অনুমান করা হয়। সুতরাং যার ওপর ফলপ্রাপ্তি নির্ভর করে তাই হলো ঈশ্বর। এক্ষেত্রে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিকগণ মনে করেন এই সূত্রটি পূর্বপক্ষের সূত্র। তবে মহর্ষি গৌতমও জগতের কারণ রূপে ঈশ্বরকেই স্বীকার করেছেন। তাই এই সূত্রে ঈশ্বরকেই কারণ হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে- এর মাধ্যমে বুঝতে হবে জীব বা তার কর্ম কারণ নয়, একমাত্র ঈশ্বরই কারণ- এইরূপ পূর্বপক্ষীর মত মহর্ষি গৌতম খন্ডন করতে চান। আসলে পুরুষ নানাবিধ কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে ফললাভ করতে চান। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কর্মের ফল লাভ হয় না, তাই কর্মফল নিজের অধীন নয়, তা পরাধীন। যার ওপর নির্ভরশীল তা সর্বশক্তিমান কোন পুরুষের কথা স্বীকার করতে হয়। কর্মের ফলের ক্ষেত্রে পুরুষ বা জীব স্বাধীন হলে কোন কর্ম নিষ্ফল হতো না। যে সর্বশক্তিমান পুরুষের ইচ্ছা অনুসারে অনাদিকাল থেকে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ইচ্ছে এবং জীবকুলের সুখ, দুঃখাদি ভোগ হচ্ছে, সেই পুরুষ ঈশ্বর। তিনি জীবের কর্ম অনুসারে সুখ দুঃখাদি ফল প্রদান করেন। যদি তাই হতো তাহলে তার সর্বশক্তিমহত্ত্বের হানি হত এবং জগতের কর্তা হিসেবেও গ্রহণ করা হতো না। সুতরাং বলা যায়, জীবের কর্মসাপেক্ষ ঈশ্বরকে জগতের কারণ হিসাবে গণ্য করা যায় না, জীবের কর্ম নিরপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। এটাই পূর্বপক্ষীদের মত।

তাৎপর্য টীকাকার শ্রীমদ্ বাচস্পতি মিশ্র "ঈশ্বরঃ কারণং" এই বাক্যের দ্বারা জগতের উপাদান কারণ ব্রহ্ম-এরূপ মতকেই মহর্ষি গৌতমের পূর্বপক্ষ রূপে গণ্য করেছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মের পরিণাম হলো এই জগত বা এই জগত ব্রহ্মের বিবর্ত- এইরূপ মত জগতের উপাদান কারণ রূপে ব্রহ্মকেই স্বীকার করেছেন। তাৎপর্য টীকাকার এরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করলেও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ, পরবর্তী নব্যনৈয়ায়িক গণ একে প্রকৃত ব্যাখ্যা বলে গ্রহণ করেননি। আচার্য বিশ্বনাথ বাচস্পতি মিশ্রের মতকে পূর্বপক্ষ রূপে গ্রহণ করলেও শেষে মনে করেন, কর্ম নিরপেক্ষ ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ- এইরূপ মত খন্ডনের উদ্দেশ্যেই এই ধরণের প্রকরণের কথা বলা হয়েছে। তিনি আরো মনে করেন, জগতের উপাদান কারণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। এইরূপ খন্ডনের উদ্দেশ্যে প্রকরণটি বলেছিলেন- এরূপ প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে 'ন্যায়সূত্রবিবরণ'কার রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্যও বাচস্পতি মিশ্রের মতানুসারে উক্ত প্রকরণের ব্যাখ্যা করার পর বলেছেন, বস্তুত এখানে জগতের কারণরূপে ঈশ্বরকে সিদ্ধ করার উদ্দেশ্য এই সূত্র উল্লেখ করেছেন। এছাড়া প্রাচীন ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ও বার্ত্তিককার উদ্দোতকরও বাচস্পতি মিশ্রের মত ব্যাখ্যা প্রদান করেননি। তাঁরাও পূর্বপক্ষ রূপে জীবের কর্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত কারণ-এইরূপ মত প্রকাশ করেছেন। এই জন্য এখানে বাচস্পতি মিশ্রের মত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি।

পরবর্তী সূত্রে বলেছেন "ন পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ"[৩০] অর্থাৎ জগতের কারণরূপে জীবের কর্মনিরপেক্ষভাবে একমাত্র ঈশ্বরই নয়। কেননা জীব কোন কর্ম না করলে ফললাভ করতে পারে না। যদি জীবের কর্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরই সকল ফলদানের বিধাতা হতেন তাহলে জীব কোন কর্ম না করলেও সকল ফলের প্রাপ্তি হত। তাই বলা হয় জগতের কারণ জীবের কর্ম সাপেক্ষ ঈশ্বর। জীব বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন করে, কোন কর্ম শুভ আবার কোন কর্ম অশুভ। সেই শুভ অশুভ কর্ম অনুসারে ঈশ্বর ফল দান করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে জগতের উদ্ভব হয়। উদ্দোতকরও তাঁর *ন্যায়বার্তিক*-এ এই সূত্রের ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন ঈশ্বরকেই শুধুমাত্র কারণ হিসাবে গণ্য করলে

জীব কর্ম সম্পাদন করা ছাড়াই সুখ-দুঃখ উপভোগ করতো। ফলে জগতের বৈচিত্র্যের হানি হত, যেহেতু ঈশ্বরের একরূপতার জন্য কার্য একইরূপ হত। এছাড়া ব্যক্তির বা মানুষের কর্মলোপ পেত এবং মোক্ষের অভাব হতো। এইজন্য উদ্দোতকর বলেছেন, কর্মসাপেক্ষ ঈশ্বরকে জগতের কারণ বললে এই রূপ দোষ বা সমস্যা হতো না। ঈশ্বর জীবের দুঃখজনক কর্ম বা অদৃষ্ট জন্য জীবের দুঃখ সম্পাদন করেন। এইরূপ হলে সকল অদৃষ্ট ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে বা নষ্ট হলে অর্থাৎ মুক্ত আত্মায় কোন সময় দুঃখের উৎপত্তি হতো না। ফলে সেই ব্যক্তি মোক্ষলাভ করত। এর মাধ্যমে বোঝা যায় উদ্দোতকর বলতে চাইছেন পূর্বপক্ষরূপে কর্মনিরপেক্ষরূপে ঈশ্বরকেই জগতের কারণরূপে পূর্বসূত্রে উল্লেখ করে এই সূত্রের দ্বারা ঐ মতের খণ্ডন করেছেন।

শ্রীমদ্ বাচস্পতি মিশ্র তাঁর *তাৎপর্যটীকায়* এই সূত্রের দ্বারা ব্রহ্মবিবর্তবাদ ও ব্রহ্মপরিণামবাদ নিরসনের জন্য কোন যুক্তি প্রদর্শন করেননি। তিনি এই দুই মতবাদের সংক্ষেপে অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করে বলেন ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ হতে পারে না। মহর্ষি গৌতম ঈশ্বরকেই জগতের নিমিত্ত কারণ বলে মনে করেন। তাৎপর্যটীকাকার জীবের কর্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরের নিমিত্ত কারণের খন্ডন এই সূত্রের দ্বারা করে তা উল্লেখ করেছেন। রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য *ন্যায়সূত্রবিবরণ* গ্রন্থে তাৎপর্যটীকাকারের অনুসারে পূর্বপক্ষকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং এই সূত্র দ্বারা জগতের উপাদান কারণ হচ্ছে ব্রহ্ম- এই বিষয়ে এই সূত্রের কোন তাৎপর্য নেই বলে মনে করেন। সুতরাং বলা যায় বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জীবের কর্মসাপেক্ষ ঈশ্বরকেই জগতের কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, জীবের কর্মানুসারে ঈশ্বর ফলপ্রদান করে থাকেন অর্থাৎ কাউকে সুখ বা কাউকে দুঃখ প্রদান করে থাকেন। ঈশ্বর স্বেচ্ছাবশত জীব কর্ম না করা সত্ত্বেও কাউকে সুখ, কাউকে দুঃখ রূপ ফল প্রদান করলে পক্ষপাত ও নৈঘৃণ্যে (নির্দ্দয়তা) দোষের আপত্তি ওঠে। কিন্তু ঈশ্বর তা করেন না। এক্ষেত্রে কর্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরের জগতের নিমিত্ত কারণত্ব- এরূপ অবৈদিক মতবাদের খন্ডন করা হয়েছে।

পরবর্তী সূত্রে মহর্ষি গৌতম তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার করে বলেছেন "তৎকারিতত্বাদহেতুঃ"[৩১] অর্থাৎ জীবের কর্মফল ঈশ্বর জনিত, সমস্ত কর্মফলের বিধাতা হল ঈশ্বর। এই কারণে পূর্বের সূত্রে যা বলা হয়, 'জীবের কর্মাভাবে ফল উৎপত্তি হয় না', এরূপ হেতু জীবের সমস্ত কর্মফলের কারণ জীবের কর্মই হয়, ঈশ্বর কারণ হিসাবে গণ্য হয় না। এই বিষয়ে সাধক হেতু হয় না।

সূত্রে যে 'তৎ' শব্দের কথা বলা হয়েছে তা ঈশ্বরকেই গ্রহণ করা হয়েছে, তাই 'তৎকারিতত্বাৎ' এর অর্থ করা হয়েছে 'ঈশ্বর কারিতত্বাৎ'। এর অর্থ করতে গিয়ে ভাষ্যকার বলেছেন জীবের কর্মকে ঈশ্বর অনুগ্রহ করেন। ঈশ্বর জানেন জীব কর্মসম্পাদন করার ফলে কোন সময়ে কি ফল উৎপন্ন হবে, সেই অনুসারে জীবের কর্মফল ঈশ্বর সম্পাদন করেন। জীব কর্মসম্পাদন করলে সর্বত্র জীবের ফললাভ করলে তা জীবের কর্মকে কারণ হিসাবে গণ্য করা যায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তা হয় না, কেননা, জীবের কর্ম সব সময় ফল উৎপাদন করে না। কোন সময়ে ঈশ্বর জীবের কর্মফল সম্পাদন না করলে, সেই সময় জীবের কর্ম নিষ্ফল হয়। এইজন্যই অনেক ক্ষেত্রে জীবের কর্মের বৈফল্য দেখা যায়। তাই বলা যায় কেবল কর্মই নয়, কর্মফল বিধাতারূপে ঈশ্বরও কারণ হয়। সুতরাং পূর্বসূত্রে যে হেতুর কথা বলা হয়েছে তা শুধুমাত্র জীবের কর্মের কারণত্ব সাধক হেতু হয় না। এই বিষয়টি মহর্ষির তৎকারিতত্বাৎ হেতু বাক্যের দ্বারা স্পষ্ট হয় এবং এই সূত্রে পূর্বোক্ত হেতুকে অহেতু বলেছেন। তবে, এমন বলেননি এটি কোন সাধ্যের সাধক হেতু হতে পারে না।

জীব যে কর্ম করে ফললাভ করতে চায়, সেই ফল লাভের জন্য সেই কর্ম কেবল কারণ নয়। সেই ফলাফল লাভের কারণ হিসেবে ফললাভের প্রতিবন্ধকাভাব, উক্তকর্মের ফললাভের কাল, স্থান, জীবের পূর্বাপূর্ব কর্ম বা অদৃষ্টকে গণ্য করা হয়। এই সমস্ত বিষয় ঈশ্বরই জানেন। তাই জীবের কর্মের ফলদাতা একমাত্র ঈশ্বর। উক্ত কারণগুলি না থাকলে জীবের কর্মের ফলবিধান ঈশ্বর করে থাকেন না। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মের বৈফল্য ঘটে। সুতরাং এই সূত্রের দ্বারা একথাও বোঝা যায় ফললাভের ক্ষেত্রে কর্ম কারণ হলেও সেই কর্ম সবসময় ফল উৎপাদন করবে এই বিষয়ে পূর্বোক্ত হেতু অহেতু হয়।

উদ্দোতকর মনে করেন জীব যে কর্ম যেভাবে করেন এবং যখন সেই কর্মের ফলভোগ হবে, সেই সময়ে সেইভাবে কর্মের যথার্থ ফলবিধান করাকে কর্মের অনুগ্রহ বলে। তিনি আরো বলেন জীবের যে কর্মকে অপেক্ষা করে ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি করেছেন সেই কর্মের প্রযোজককর্তা ঈশ্বর। জীবের সেই কর্ম ও কর্মফল সম্ভব হতো না ঈশ্বরের ইচ্ছা

ছাড়া। অর্থাৎ জীবের কর্মকে অপেক্ষা করে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করলে সর্বেশ্বরত্ব, ঈশ্বরত্ব ক্ষুন্ন হয় না। কর্মসাপেক্ষ ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ এর খন্ডনে কোন হেতু পাওয়া যায় না। সুতরাং কর্ম নিরপেক্ষ ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ এ কথা নিরস্ত হয়েছে।

জীবের কর্মকে অপেক্ষা করে ঈশ্বর বিভিন্ন জীব ও জগতের সৃষ্টি ও ধ্বংস করেন। জীবকে সুখ-দুঃখ প্রদান করেন। তাই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পক্ষপাত ও নৈঘৃণ্যের আপত্তি ওঠে না। কিন্তু জীবের কর্মকে অপেক্ষা না করে এরূপ কাজ করলে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পক্ষপাত ও নৈঘৃণ্যের আপত্তি উঠত।

বৈচিত্র্যময় জগতের নিমিত্ত কারণ হিসাবে অদৃষ্ট ও জীবের কর্মকে স্বীকার করা হয়। কিন্তু এরা ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

এছাড়াও প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ উক্ত আটটি সাধারণ নিমিত্ত কারণ ছাড়াও প্রতিবন্ধক সংসর্গাভাব নামে একটি কারণ স্বীকার করেছেন। এই প্রতিবন্ধক সংসর্গাভাব সকল কার্যের প্রতি কারণ হওয়ায় এটি সাধারণ নিমিত্ত কারণ হিসাবে গণ্য হয়। এর স্বপক্ষে দুটি যুক্তি দিয়েছেন সেগুলি হল- প্রথমত কার্য ভাব ও অভাব দুইই হয়। এমনকি মীমাংসকগণ ঘটাভাবকে কার্য হিসাবে গণ্য করেছেন। কার্য অভাব হলে কারণও অভাব হতে পারে। দ্বিতীয়ত- প্রতিবন্ধ পদের অর্থ করতে গিয়ে বলা হয়েছে "প্রতিবন্ধো বিসামগ্রী" অর্থাৎ বিসামগ্রী অর্থাৎ "সামগ্রী বৈকল্য"। যদি কোন কারণ না থাকলে সামগ্রীর বৈকল্য বা কারণের অভাব ঘটে, সেই কারণের অভাবই বিসামগ্রী অর্থাৎ প্রতিবন্ধ। মণ্যভাব দাহের প্রতি অন্যতম কারণ, সেই মণ্যভাবের অভাব অর্থাৎ মণি হল প্রতিবন্ধ। সেই স্থলে যে মণিকে উপস্থিত করেছে সেই ব্যক্তিই প্রতিবন্ধক। নৈয়ায়িকগণ মণিকে প্রতিবন্ধক না বলে মনি উপস্থিত করেছে যে ব্যক্তিকেই প্রতিবন্ধক বলেন।[৩২]

পরিশেষে বলা যায়,এই আলোচনার ক্ষেত্রে জগৎ বলতে সমগ্র জগৎ ও জগতে যে বিষয় বা ঘটনাগুলি ঘটে সবটাকেই বোঝানো হয়েছে। আলোচনা প্রসঙ্গে এসেছিল নিমিত্ত কারণ দুই প্রকার- সাধারণ নিমিত্ত কারণ ও অসাধারণ নিমিত্ত কারণ। সাধারণ নিমিত্ত কারণ সমস্ত কার্যের পূর্বে থাকে। সাধারণ নিমিত্ত কারণগুলি হল ঈশ্বর, ঈশ্বরের জ্ঞান, ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের প্রযত্ন, অদৃষ্ট, দিক, কাল, প্রাগভাব। এছাড়া প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ প্রতিবন্ধক সংসর্গাভাবকে স্বীকার করে নিয়েছেন। অসাধারণ নিমিত্ত কারণ প্রতিটি কার্যের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন বস্ত্রের ক্ষেত্রে তুরী, বেমা, তন্তুবায় নিমিত্ত কারণ হিসেবে গণ্য হয়। এই নিমিত্ত কারণ গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমতঃ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভিন্ন ঘটনা বা বিষয়বস্তুর কারণগুলি জানতে চায় এবং ফলাফল গুলিকে নিজের অনুকূলে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। এক্ষেত্রে বস্তু বা বিষয়ের নিমিত্ত কারণ গুলি জানতে পারলে সেগুলি সম্পর্কে যেমন ভবিষ্যৎবাণী করা যায়, তেমনি কিছু ক্ষেত্রে ফলাফলকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অসাধারণ নিমিত্তকারণের ক্ষেত্রে এটি সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন তন্তুবায় সচেতন হলে এবং তুরী, বেমা ইত্যাদি যন্ত্রপাতিগুলি উন্নত মানের হলে সহজেই ভালো বস্ত্র উৎপন্ন করা যায়। আবার সাধারণ নিমিত্তকারণের ক্ষেত্রেও এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কেননা জীব যে কর্ম করে সেই কর্মজনিত অদৃষ্ট ঈশ্বরের প্রযোজনায় ফল প্রদান করে। ব্যক্তি ভালো কর্ম করলে কর্ম জনিত অদৃষ্টের ফলে ভালো ফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিপরীতে মন্দ ফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই ভালো ফল গ্রহণের জন্য ভালো কর্ম করতে হবে। এইভাবে কার্যকে নিয়ন্ত্রণ করার সম্ভাবনাও থাকে।

দ্বিতীয়তঃ জগতে কেন ঘটনাটি ঘটছে- নিমিত্ত কারণ তার ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। ফলে কারণগুলি জানার ফলে অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়।

তৃতীয়তঃ নিমিত্ত কারণগুলো একটা বৃহৎ কার্যকারণ শৃঙ্খলের একটি অংশ মাত্র। এই কার্যকারণ শৃঙ্খলগুলি উপলব্ধির মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে যে আন্তঃসংযুক্ততা রয়েছে তার জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়।

চতুর্থতঃ নিমিত্তকারণের জ্ঞানের মাধ্যমে যাবতীয় কর্মের মালিকানা যে ব্যক্তি তা উপলব্ধি হয়।

পঞ্চমতঃ জগতের স্রষ্টা হিসাবে ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয়। মানুষ তার সৃষ্টি। এই মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ক রয়েছে। তবে তা একমুখী। মানুষ ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। এই মানুষ ও ঈশ্বর উভয়ে নিমিত্ত কারণ হিসাবে গণ্য হয়। সাধারণ নিমিত্ত কারণ হিসাবে ঈশ্বর রয়েছে, অসাধারণ নিমিত্ত কারণ হিসাবে ব্যক্তি গণ্য হন। যেমন -তন্তুবায় বস্ত্র উৎপন্ন করেন, আবার ব্যক্তি যে কর্ম করেন তা ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ষষ্ঠতঃ ঈশ্বরকে ন্যায়বিচারের কর্তা হিসাবে গণ্য করা হয়। ব্যক্তির ভালো কাজের জন্য পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তি প্রদান করেন ঈশ্বর।ঈশ্বরকে নৈতিক আইনের উৎস হিসাবে গণ্য করা হয়।

সপ্তমতঃ ঈশ্বরের কাছে ব্যক্তি আত্মসমর্পণ ও ভক্তি নিবেদনের মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি লাভ করতে চান। এই কাজে ঈশ্বর সাহায্য করে থাকেন।

অষ্টমতঃ ন্যায়দর্শনে জীবের ইচ্ছার স্বাধীনতা শর্তাধীন। ঈশ্বর জীবকে করুণাবশত কিছুটা স্বাধীনতা প্রদান করলেও জীব তার ইচ্ছা অনুসারে কৃতকর্মের ফললাভ করতে পারে না। ফলে এক্ষেত্রে স্বাধীন ইচ্ছা এবং নিয়ন্ত্রণবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করেছেন।

নবমতঃ ঈশ্বর যে নিমিত্ত কারণ তার স্বপক্ষে কিছু যুক্তি প্রদান করা যায়। (ক) মহাবিশ্বের জটিলতা, ক্রম ইত্যাদি একজন বুদ্ধিমান প্রকৌশলীকে স্বীকার করতে হয় তিনি হলেন ঈশ্বর। (খ) মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য একটি কারণ স্বীকার করতে হয় যার কোন কারণ থাকবে না। তিনি হলেন ঈশ্বর।

দশমতঃ যে সাধারণ নিমিত্তকারণের কথা বলা হয় তা সকল কার্যের ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে উপস্থিত থাকে। ভারতীয় নীতিতত্ত্বে সাধারণ ধর্ম স্বীকার করা হয় যেগুলি সমস্ত মানুষ মেনে চলে। অনুরূপভাবে সকল কার্যের পশ্চাতে সাধারণ নিমিত্ত কারণ স্বীকার করা হয়।

সবশেষে, একথা বলতে পারি যে, অন্তিম নিমিত্ত কারণ হিসেবে ঈশ্বরকে স্বীকার করা হচ্ছে। যিনি সমগ্র জগৎ এবং জগতের বিভিন্ন বিষয়বস্তু, দেশ, কাল, পদার্থ বিন্যস্থ করেছেন। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং সমগ্র বিশ্ব যার নিয়ন্ত্রণাধীন এবং বুদ্ধিমান প্রকৌশলী হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি বিশ্বজগত একটি উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা নিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

তথ্যসুত্র:

১. সিনহা, যদুনাথ, *ইনট্রোডাকসন টু ফিলসফি*, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৬

২. দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবায়াভাবাঃ সপ্তপদার্থাঃ।।
শ্রীমদ্ অন্নংভট্ট, *তর্কসংগ্রহ* (দীপিকাটীকা সহিত). শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী (ব্যাখ্যা), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩

৩. তদেব, পৃ. ২৯৩

৪. তদেব, পৃ. ২৯৩

৫. তদেব, পৃ. ২৯৩

৬. তদেব, পৃ. ৩০২

৭. তদেব, পৃ. ৩০২

৮. তদেব, পৃ. ৩০২

৯. তদেব, পৃ. ৩০২

১০. তদেব, পৃ. ৩০২

১১. শ্রী কেশব মিশ্র, *তর্কভাষা* (দ্বিতীয় খণ্ড), শ্রী গঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য (বঙ্গানুবাদ- বিবৃতিসহিতা), কর্মসচিব যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১৪৩-১৪৬.

১২. শ্রীমদ্ অন্নংভট্ট, *তর্কসংগ্রহ* (দীপিকাটীকা সহিত), শ্রী পঞ্চানন শাস্ত্রিণা (অনুবাদ ও ব্যাখ্যা), মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ভাদ্র ১৩৯২, পৃ. ৬৮

১৩. শ্রী কেশব মিশ্র, তর্কভাষা (দ্বিতীয় খণ্ড), শ্রী গঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য (বঙ্গানুবাদ-বিবৃতিসহিতা), কর্মসচিব যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১৮০

১৪. শ্রীমদ্ অন্নংভট্ট, *তর্কসংগ্রহ* (দীপিকাটীকা সহিত), শ্রী পঞ্চানন শাস্ত্রিণা (অনুবাদ ও ব্যাখ্যা), কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ভাদ্র ১৩৯২, পৃ. ৭০

১৫. তদেব, পৃ. ৭০-৭১

১৬. শ্রী কেশব মিশ্র, *তর্কভাষা* (দ্বিতীয় খণ্ড), শ্রী গঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য (বঙ্গানুবাদ- বিবৃতিসহিতা), কর্মসচিব যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৩৮৪-৩৮৭
১৭. তদেব, পৃ. ৩১৮
১৮. তদেব, পৃ. ৩১৮
১৯. তদেব, পৃ. ৩১৮-৩১৯
২০. শ্রী কেশব মিশ্র, *তর্কভাষা* (দ্বিতীয় খণ্ড), শ্রী গঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য (বঙ্গানুবাদ- বিবৃতিসহিতা), কর্মসচিব যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৩১৯-৩২০
২১. শ্রীমদ্ উদয়নাচার্য, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি*, ডঃ চন্দন ভট্টাচার্য (হরিদাসী 'ব্যাখ্যাবিবৃতি' টীকা ও সম্পাদককৃত আলোচনাসহ), মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ২১-২২
২২. তদেব, পৃ. ২১
২৩. তদেব, পৃ. ২৫
২৪. তদেব, পৃ. ২৫
২৫. শ্রীমদ্ উদয়নাচার্য, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি*, শ্রী মোহন ভট্টাচার্য (অনুবাদ ও ব্যাখ্যা), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১৩-১৪
২৬. শ্রীমদ্ উদয়নাচার্য, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি*, ডঃ চন্দন ভট্টাচার্য (হরিদাসী 'ব্যাখ্যাবিবৃতি' টীকা ও সম্পাদককৃত আলোচনাসহ), মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ২৫-২৬
২৭. তদেব, পৃ. ২৬
২৮. তদেব, পৃ. ২৬-২৭
২৯. মহর্ষি গৌতম, *ন্যায়দর্শন* (বাৎস্যায়ন ভাষ্য সহ) চতুর্থ খণ্ড, ফণীভূষণ তর্কবাগীশ (অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও সম্পাদনা), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৪২
৩০. তদেব, পৃ. ৫০
৩১. তদেব, পৃ. ৫২
৩২. শ্রীমদ্ উদয়নাচার্য, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি*, ডঃ চন্দন ভট্টাচার্য (হরিদাসী 'ব্যাখ্যাবিবৃতি' টীকা ও সম্পাদককৃত আলোচনাসহ), মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৪৩-৪৪